***International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)***
*A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal*
*ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)*
*ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)*
*Volume-VI, Issue-I, July 2019, Page No. 54-64*
*Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711*
*Website: http://www.ijhsss.com*
**DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i1.2019.54-64**

# সময় ও পরিসরের মহাকাব্যিক আখ্যান: ভগীরথ মিশ্রের 'মৃগয়া'

**বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য**
*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম, ভারত*

**Abstract:**

*'Mrigaaya' Volume I was published in the last decade of the 20th century. However, novelist Bhagirath Mishra has not confined himself to contemporary times alone. His storytelling brings forth a history spanning two hundred years. The journey of the discussed novel begins in 1793, when the seeds of the Permanent Settlement were sown in this country, and it concludes temporarily with the Zamindari Abolition Act (1953) and the Land Reform Policy (1955). The author presents a vast picture of how feudal society gradually fell into the clutches of capitalism and later, how feudalism and capitalism rooted themselves in society. Along with this, many characters, who expanded their thoughts with time and eventually vanished on the gallows of another era, have emerged in the narrative. Through his writing, the novelist has depicted a grand testament of the emotions and sentiments associated with feudalism on one hand, and on the vast canvas of the novel, on the other hand, he has portrayed a living image of class disparity. Additionally, the novel reflects various aspects of rural life, such as folk sayings, folklore, folk culture, folk beliefs, and folk tales.*

**Key words: Epic Novel, Zamindari, feudalism and capitalism, class disparity.**

উপন্যাস হল জীবনশিল্প। বাস্তব ঘনিষ্ঠতা এবং প্রখর বাস্তবতাবোধ ব্যতীত আধুনিক উপন্যাস সাহিত্য গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বাংলাদেশে যত ধরনের সাহিত্য তৈরি হয়েছে তার প্রধানতম হল উপন্যাস। ব্যক্তিত্ববোধ ও বাস্তববোধ দুইয়ের অন্বয়েই গড়ে উঠতে পারে সার্থক উপন্যাস। মানুষের জীবন সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ এবং সেই জীবনকে সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থাৎ গল্প শোনার আগ্রহ নিয়েই উপন্যাসের জন্ম। উপন্যাস এমনই শিল্পমাধ্যম যেখানে সর্বপ্রথম মানুষকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। Ralph Fox বলেছেন—

> "The novel not merely fictional prose, it is the Prose of human life, the first art to attempt to take the whole man and give him expression."[১]

বিষয়গত ও অঙ্গিকগতভাবে উপন্যাসকে নির্দিষ্ট কোনো ছকে ফেলে আলোচনা করা সম্ভব নয়। নাটক বা কবিতা যেমন নির্দিষ্ট কিছু ছকের মধ্যে কিরণ করে উপন্যাস সে রকম গড়ে উঠেনা। ফলত উপন্যাসের নির্দিষ্ট কোনো শিল্পরূপ বা art form বোধ হয় এখনও নির্ণীত হয়নি। 'পামেলা' উপন্যাসের মাধ্যমে রিচার্ডসনের হাত দিয়ে ইংরেজি উপন্যাসের যে সূচনা ঘটেছিল। তা লেখা হয়েছিল পত্রাকারে, সার্থক উপন্যাসের আজ কত রূপান্তর ঘটেছে বাংলাসাহিত্যের উপন্যাসের দিকে লক্ষ করলেই তা উপলব্ধি করা যায়। উপন্যাসের বিশিষ্ট জীবনদর্শন বলতে আমরা বুঝি জীবনকে দেখার এক মৌলিক জীবনদৃষ্টি, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে 'attitude towards life'। জীবনকে দেখার এই পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিভিন্ন লেখক তাঁর নিজস্ব শিল্প তুলে ধরেন। মহাকাব্যিক উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সহজ সরল বক্তব্যের মাধ্যমে মূল বিবরণকে উপস্থাপিত করা। আর মূলত প্রত্যেক ঔপন্যাসিকই তার রচনায় সেটিকে অনুসরণ করেন। ঔপন্যাসিক এখানে ঐতিহাসিক স্রষ্টার মত সব কিছুকে প্রত্যক্ষ করেন কিন্তু সহজ সরল স্পষ্টতার মধ্য দিয়ে সমস্ত কিছুকে উপস্থাপিত করেন,

> "মহাকাব্যের বর্ণনায় যে সরলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা এবং ঋজুতা থাকে, যে বিশালতা মহাকাব্যকে সর্বসাধারণের বিষয় করে তোলে; এই পদ্ধতি অনেকাংশে তারই অনুসারী।"[২]

ঔপন্যাসিক এখানে নিজেকে বহুদিকে বিচরণ করার যেমন সুযোগ পান, তেমনি যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতে পারেন উপন্যাসে নিজেকে সহজভাবে সংযুক্ত করার। জীবনকে জীবনের মতো তুলে ধরার প্রচেষ্টাও উপন্যাসে নিজেকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। যাকে বলা যেতে পারে বাস্তব ও জীবনের মায়া (illusion) সৃষ্টি। অভিজ্ঞতার শক্তি আসলে একটা প্রচণ্ড অনুভবের শক্তি এবং অনুভব ক্রিয়া লেখকের সৃষ্টি-চেতনার প্রকোষ্ঠে তাৎপর্যপূর্ণ জাগতিক ব্যাপারের এক আশ্চর্য প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করতে পারে এবং তারই ফলে গড়ে ওঠে এক নিজস্ব মানস পরিবেশ। জীবন ও জগতের মায়া সৃজনের যা এক পরিপূরক শক্তি।

একজন ঐতিহাসিক যেমন পুরোনো যোগকে শুধু পরম্পরাগতভাবে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নিয়েই কাজ শেষ করেন না, তাকে একটি নির্দিষ্ট সূত্রের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়, নাহলে তার তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি মহাকাব্যকারও একটি বিশেষ যুগের সামগ্রিক জাতীয় জীবনকে রূপকাশ্রিত পটে বিম্বিত করার পরও মানবজীবনের এমন কিছু সাধারণ নিয়ম ও প্রত্যয় তাকে তুলে ধরতে হয়, দেশ-কাল আপেক্ষিত নয়, পাত্রে তা আকার বদল করে না, ব্যক্তি মানুষের তা একান্ত অভিরুচির বিষয় নয় তা নৈর্বৈক্তিক এবং নির্বিশেষে তো বটেই। মহাকাব্য এবং মহাকাব্যিক উপন্যাস দুটির গোত্র সেখানে এরকম। মহাকাব্যে যত সব মহা-চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায় তাদেরকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সে সব চরিত্র শুধুমাত্র 'ব্যক্তি'ই নয়, মানবসত্তায় তাঁদের ব্যক্তিত্ব নিরঙ্কুশ। সেই সব চরিত্র শুধুমাত্র সেই যুগকেই আলোকিত করেনা, তা চিরন্তন মানবসত্তার, তাদের ব্যক্তিত্ব নিরঙ্কুশ। মহাকাব্য এবং মহাকাব্যিক উপন্যাস দুয়েই অসংখ্য চরিত্র, অগণিত উপাখ্যান ব্যষ্টিগত প্রাতস্বিকতায় অনবচ্ছিন্ন মানবশৃঙ্খল রচনা করে। সাহিত্যিক মহাকাব্য সম্পূর্ণ আধুনিক কালের এবং সম্পূর্ণ একক কবির রচনা। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে কখনও কাহিনি গ্রহণ করলেও মানুষই তার একমাত্র নায়ক। বস্তুধর্মিতা, আলংকারিক বিধিনিষেধের বাইরে থেকে ভাষার উৎকর্ষ সাধনই এখানে প্রবলভাবে থাকে, যা আধুনিক মহাকাব্যিক উপন্যাসেরও যুগপত ধর্ম।

উপন্যাসকে যদি মহাকাব্যিক স্তরে পৌঁছতে হয় তাহলে শুধুমাত্র তাতে উৎকৃষ্ট শিল্পভাবনা থাকলে চলেনা, তাকে হয়ে উঠতে হয় মহৎ শিল্প। আর মহৎ শিল্প হতে হলে লেখককে কবিমনের অধিকারী হতে

হয় তেমনি থাকতে হয় দার্শনিক মননশীল মন। সুতরাং বলা যেতে পারে লেখক হবেন ক্রান্তদর্শী কবি এবং দার্শনিক। সত্য-মিথ্যা, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব নিয়েই মানুষের সামনে তুলে ধরতে হয়। মহাকাব্যের সময়কাল ও আজকের সময়কাল যদিও পাল্টে গেছে, কিন্তু পুরনো প্যাটার্ণ ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে নতুন প্যাটার্ণ এবং যা অবারিত নতুনত্বের দিকে ছুটে চলছে। আধুনিক জীবন যদিও বা ছিন্নমূল, অনেক বেশি জটিল ও প্রশ্নসংকুল। তবুও তার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে টোটালিটি বা সমগ্রতা। মহাকাব্যকার জীবনের এই সুরকেই খুঁজতে চান, তুলে ধরতে চান মননশীল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে।

মহাকাব্যিক উপন্যাসে নর-নারীর প্রেম, জটিল দ্বন্দ্ব, ঘূর্ণাবর্ত শুধু থাকেনা, সেখানে লেখকের নিজস্ব একটি উদ্দেশ্যমূলকতা কাজ করে। এই উদ্দেশ্যে আবার লেখকের সংকীর্ণ মনের সীমাবদ্ধ ভাবনা নয়, তাতে বিশ্বভাবনার অবকাশ থাকতে হয়। থাকতে হয় মানব-জীবনের মান্যকৃত সত্যকে চিনে নেওয়ার অবকাশ। জীবনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেখানে পক্ষপাতিত্ব করা চলেনা, তাকে থাকতে হয় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত। বাংলা উপন্যাস সাহিত্য শুরু হওয়ার সময় থেকে অনেকগুলি উপন্যাস লেখা হয়েছে যা মহাকাব্যিক উপন্যাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমরা লক্ষ করেছি মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখার স্টাইল ক্রমশ বদলে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যে উপন্যাস আর আজকের লেখা উপন্যাসের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) উপন্যাস ইতিহাস ভিত্তিক মহাকাব্যিক উপন্যাস। ইতিহাসের রোমান্স নয়, ইতিহাসের মর্মোদ্ঘাটনই তার বৈশিষ্ট্য এবং তার সঙ্গে বলা যায় মানব-জীবনের সত্যকে নির্বিশেষ ভাবে সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই ইতিহাসগত সত্য ও মানব-জীবনের সত্যের সম্মিলনেই 'রাজসিংহ' মহাকাব্যিক উপন্যাসের মর্যাদা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস দেশ, কাল, গোত্রভিত্তিক উপন্যাস। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল তারই পটভূমিতে নায়ক গোরার চরিত্রই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (অখণ্ড ১৯১৭-৩৪) হৃদয় ভিত্তিক উপন্যাস বলে খ্যাত। তিনি ছিলেন অন্তলোকের শিল্পী, তাই নর-নারীর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে 'শ্রীকান্ত' প্রেমভিত্তিক মহাকাব্যিক উপন্যাসের মর্যাদায় উত্তীর্ণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯৩২) বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যেখানে লেখক নায়ক অপু বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে সুখদুঃখময়, আনন্দ-বেদনাঘন, জন্মমৃত্যুদীর্ণ জীবনকে পেরিয়ে এক মহাজীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' (১৯৪২) সমাজের উপর ভিত্তি করে রচিত। পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করেই মূলত তাঁর কথাসাহিত্য আবর্তিত। এরমধ্যে গণদেবতায় পল্লীজীবনের নরনারীর সামগ্রিক জীবন, কালের পরিবর্তনে সমাজের উত্থান পতনের যে চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, সেখানে তারাশঙ্করের প্রতিভা সক্রিয়। সেখানেই গণদেবতা পল্লীজীবনের মহাকাব্য।

বিশ শতকের বাঙালি ঔপন্যাসিক যখন বৃহৎ জনজীবনের গতি, বিকাশ ও স্পন্দনের সত্যতায় মহাকাব্যিক রচনা আদর্শের কথা ভেবেছেন তখন রূপাবয়বের আদর্শে মহাকাব্য বা মঙ্গলকাব্যের কাঠামো গৃহীত হয়েছে কিন্তু জনগোষ্ঠীর নির্বাচনে কুরুবংশের মতো কোনো উচ্চবর্ণের মানুষের কথা ভাবেননি। তাঁরা বেছে নিয়েছেন শোষিত, নির্যাতিত, নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীকে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৫৬ সালে। ঠিক মহাকাব্য হয়তো নয়, কিন্তু মহাকাব্যের ধরন অনেকটাই উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র (প্রথম খণ্ড এপ্রিল ১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড জুলাই ১৯৭১) মধ্যেও মহাকাব্যিক উপন্যাসের শিল্পিত রূপ খুঁজে পাই। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড যদি হয় যৌথ জীবন-যাপনের প্রকৃতি ও মানুষের আবার মিলনের ছবি; তাহলে দ্বিতীয় খণ্ডে যবনিকা

কম্পমান, এমন কি চরিত্ররাও উন্মিলীত হয়ে গেছে। চেনাজানা পাশ্চাত্য রীতির উপন্যাসে উপস্থাপনায় আমরা যখন ক্লান্তি অনুভব করি। তখন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশি রচনারীতি আমাদের স্বস্তি প্রদান করে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৮৮। রচনাকাল তার পূর্ববর্তী কয়েক বছরব্যাপী। আমরা দেখেছি মহাভারতের মহাপ্রস্থান যাত্রাটিও একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে শুরু হয়েছিল। কিন্তু বাঘারুর সামনে নির্দেশিত কোনো দেশ নেই, থাকার কথাও নয়। এই গতি থাকা এবং গন্তব্য না থাকার মধ্য দিয়েই 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' হয়ে ওঠে একালের উপন্যাস। আমরা 'মৃগয়া' (১৯৯৬-২০০০) উপন্যাসেও লক্ষ করি দেশজ স্টাইলের এক নতুন উপস্থাপনা। ফলত আজকের উপন্যাস সাহিত্য গল্পকে গ্রহণ করার স্টাইল যেমন পালটে দিয়েছে, তেমনি বদলে গেছে তার উপস্থাপন রীতি।

যুগ এগিয়ে যায়, এগিয়ে যায় সমাজ। কিন্তু তার মধ্যে খুব নিঃশব্দে বয়ে যায় সময়। উপন্যাস আমাদের শুধু আনন্দ দানই করেনা; সার্থক উপন্যাস যুগকে পেরিয়ে এক মহাযুগের সূচনা করে। আপাতসময় ও চিরন্তন সময়ের ধারাভাষ্যে পরিসর হয়ে ওঠে দ্বিবাচনিকতার এক অমোঘ দর্পণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় লেখকের সময় এবং উপন্যাসের সময় এক নাও হতে পারে। লেখক বর্তমানে দাঁড়িয়ে খুঁজে নিতে পারেন অতীত সময়ের ধারাভাষ্যকে। আমরা যা চোখে দেখতে পাইনা, লেখকের দ্রষ্টাচক্ষুর মাধ্যমে তা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় । ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়,

> "ঔপন্যাসিক যথাপ্রাপ্ত সময়ের ভাষ্যকার নন কেবল তিনি সময়ের প্রস্তাবকও। যেভাবে আমরা সময়কে দেখেছি, সেই দেখাকে মান্যতা দেওয়ার জন্যে তিনি উপন্যাস লেখেন না। বরং যা দেখিনি বা দেখলেও ভুল দেখেছি, সেদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে শেখান।"[৩]

সময় ও সমাজের দ্বিরালাপে তৈরি হয় উপন্যাস এবং পৌরসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত হয় সময়। মানুষ এই সময়ের কাছে বড়ই অসহায়। আর এই অসহায়ত্বের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি উপন্যাস 'মৃগয়া'। 'মৃগয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় বিশ শতকের শেষ দশকে। কিন্তু ঔপন্যাসিক ভগীরথ শুধুমাত্র সমকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তাঁর কথকতার মধ্যে উঠে এসেছে দীর্ঘ দু'শ বছরের ইতিহাস। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বীজ যখন রোপিত হয়ে যায় এদেশে, তখন থেকে আলোচ্য উপন্যাসের যাত্রা শুরু এবং আপাতসমাপ্তি জমিদারী উচ্ছেদ আইন (১৯৫৩) এবং ভূমিসংস্কার (১৯৫৫) নীতির মধ্য দিয়ে। সামন্তবাদী সমাজ কীভাবে পুঁজিবাদের দখলে ধীরে ধীরে চলে যায় এবং পরে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ কীভাবে নিজের শেখড় প্রোথিত করে নেয় সমাজে তার একটা বিরাট চিত্র আমাদের সামনে লেখক তুলে ধরেছেন। তার সঙ্গে উঠে এসেছে সময়ের স্রোতে ভাসমান অনেক চরিত্র। যারা সময়ের সাথে সাথে নিজের ভাবনাকে বিস্তার করেছে, আবার হারিয়ে গেছে অন্যসময়ের যূপকাষ্ঠে। ঔপন্যাসিক তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তুলে ধরেছেন সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জড়িত মানুষের হৃদয়ভাবনার এক বিরাট দলিল; তেমনি উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে অপরদিকে রয়েছে শ্রেণি বৈষম্যের এক জীবন্ত চিত্র আর অপরদিকে লোকপ্রবাদ, লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি, লোকবিশ্বাস, লোককথা প্রভৃতি গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র।

উপন্যাসের শুরু হয়েছে 'মুমূর্ষুর জবানবন্দী' দিয়ে। কিন্তু এ 'মুমূর্ষু' কোনো ব্যক্তি নয় তা আসলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং তাকে ঘিরে থাকা সামাজিক সময়। "আমি মরে যাচ্ছি, প্রতিদিন তিল তিল করে মরে যাচ্ছি" (১ম খণ্ড, পৃঃ ৯) যা শুধু সুদর্শনবাবুর জবানবন্দী নয়; তা ফিউডালি নির্মমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার

পাশাপাশি তাদের অনিবার্য পতনেরও ইঙ্গিত। কিন্তু লক্ষণীয় যে লেখক জমিদার সিংহবাবুদের জীবনের আলেখ্য তৈরি করতে রচনা করেননি এই উপন্যাস। তাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে জটিল সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিচ্ছবি। আর এই সিংহবাবুদের আধিপত্য এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও বিলুপ্ত হয়নি। অনিমেশ দস্তিদারের একটি মন্তব্যে পাই–

> "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছে- ঔপনিবেশিক উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে কৃষিজমিকে সংযুক্ত করে মধ্যস্বত্বভোগীর জটিল স্তর পরম্পরা সৃষ্টি করেছে।... স্বাধীনতালাভের দীর্ঘকাল পর পর্যন্ত কৃষিজোতে ওই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক অজস্র বিক্ষোভ, বিদ্রোহের মুখেও অটুট ছিল।"[৪]

আবার প্রতিটি উপপর্বই বিন্যস্ত হয়েছে বৃত্তান্তসূচক শিরোনাম দিয়ে; যা আসলে ভারতীয় কথকতার প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্যের সময়োচিত পুনর্নির্মাণ। আমরা খণ্ড সময়কে উপলব্ধি করি একমাত্র মহাসময়ের অভিব্যক্তির প্রতিতুলনায়। পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক আজকের উপন্যাস শিল্পে 'মৃগয়া' তাই দেশিয় উপকরণের আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সময় বড়ই নিষ্ঠুর; তার অভিঘাত থেকে কারো রেহাই নেই। যে সুদর্শন প্রতাপের আধিপত্যে যৌবনে অন্ধ ছিলেন, বৃদ্ধবয়সে এসে তিনি অতীত ও বর্তমানের যাঁতাকলে শ্বাসরুদ্ধ । জমিদার বাড়ির আভিজাত্যের প্রতীক 'আরশিতে' ছোটবেলা মুখ দেখতে চেয়েছিল নিশান বাউরি। সুদর্শন তার সাধ পূর্ণ করেছিলেন বার বার পুকুরের জলে চুবিয়ে 'জল আরশি' দেখিয়ে। সে 'নিজের মুখের প্রতিবিম্ব আর জীবনে দেখতে চায়নি' (১ম খণ্ড, পৃঃ নং- ১০)। কিন্তু সুদর্শনের কাছে এই আরশিই হয়ে ওঠে বড় শত্রু। তাই তিনি আয়নার মুখোমুখি হতে চান না:

> "তবুও এক যাদু আয়নার হাত থেকে ইদানীং তিলমাত্র রেহাই পান না সুদর্শন ..... নিজের মুখ, কাদম্বরীর মুখ, নিশান বাউরি, চন্দ্রকান্ত আচার্য, শঙ্কর প্রসাদ, প্রিয়ব্রত, প্রতাপলাল, আরও কত কত মুখ...। যন্ত্রণায় ক্ষোভে, করুণায়, প্রতিহিংসায় জীবন্ত মুখগুলি। আজকাল সুদর্শনের চোখের সামনে শুধু সার সার আয়না দোলে। যেন এক বিভীষিকা।"[৫]

মহাকাব্যিক উপন্যাসের ধারায় নিঃসন্দেহেই ভগীরথ মিশ্র এক অনন্য সাম্রাজ্যের অধিকারী। যে সাম্রাজ্য তিনি তৈরি করেছেন তা একদিনের উপার্জিত ফসল নয়, তার মধ্যে রয়েছে বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম। 'মৃগয়া' উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি এমন একটি কাহিনির অবতারণা করলেন যার মধ্যে শুধু বর্তমান সময়ই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সময়ের জটিল ঘূর্ণাবর্তে তা হয়ে ওঠে এক মহাসময়ের ক্যানভাস। রাঢ়ভূমিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস আবর্তিত হলেও চিরকালীন সময়ের ঘূর্ণাবর্তে শোষকের নির্মম চেহারা, পুঁজিবাদের ছোবল, লায়েক বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, স্বদেশী আন্দোলন, কম্যুনিস্ট আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, আদিবাসীদের উত্থান ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে লেখক সময়বোধের যে পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের অতীতকে আরেকবার চিনিয়ে দেয়।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'মৃগয়া'র পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অজস্র ব্যক্তিমানুষ। যারা শুধুমাত্র সমষ্টির বাহক নয়, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিত্বে নতুন নতুন কৌণিকতা সৃষ্টি করছে। আর মহাকাব্যিক উপন্যাসের ধরনই তাই। সে যেমন খণ্ড মানুষকে অবলম্বন করে না তেমনি খণ্ডসময়কেও বহন করে না। খণ্ড খণ্ড সময়ই নিয়ে যায় আমাদের মহাসময়ের ক্যানভাসে। তাই 'মৃগয়া'য় একক কোনো নায়কসত্তা জেগে উঠতে দেখি না। নায়ক হিসেবে কখনো মনে হয় আমাদের সুদর্শন সিংহবাবু, প্রিয়ব্রত, চন্দ্রকান্ত চাটুজ্জ্যে,

অরিজিত আবার কখনো সুকুমার, বুদ্ধদেব কিংবা পরীক্ষিত বাউরি। উপন্যাসে যেমন একক কোনো ঘটনাপ্রবাহ নেই তেমনি ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব নান্দনিক দার্শনিক ভাবনার অনতিক্রম্য প্রকাশ। এলিয়ট বলেছিলেন,

> 'এগিয়ে থাকে জীবনদৃষ্টির পূর্ণতা ও পরিপক্কতা (ripness)। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন মহাকাব্য বা মহাকাব্যোপম রচনায় থাকে যে পূর্ণতা (maturity) তা তিন রকমের maturity of mind, maturity of society, maturity of language.'[৬]

উল্লেখ্য আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে আমরা তিনটিকেই খুঁজে পাই। জমিদারী প্রথা, স্বাধীনতা আন্দোলন, মার্ক্সবাদী আন্দোলন, তেভাগা, তেলাঙ্গানা, জলডুবি প্রভৃতি নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা পূর্ণতার দিকে যাত্রা করি, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই মানব মনের চিন্তাপ্রস্থানের বিচিত্র ক্রমবিকাশ (maturity of mind)। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে আমরা যেমন ভারতাত্মার সন্ধান পাই তেমনি ভগীরথও আমাদের দর্শন করান ভারতাত্মার চিরন্তন রূপকে। হয়তো কল্পনার আধারে, তবে বাস্তব সত্যকে,

> "আমাদের দেখার পেছনে থেকে অনেকখানি না দেখা অংশ, তাকে না পেলে দেখা সম্পূর্ণ হয় না, অর্থপূর্ণ হয় না, বস্তুত সত্যও হয় না। খণ্ডিত দেখাকে পূর্ণ করা সে পারে সৃজনী কল্পনা। জীবনকে তারাই দেখতে পান, যারা মনে মনে একটু জীবন থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন। যারা তা পারেন তারাই শিল্পী। তাঁরা যা পরিবেশন করেন তা অবশ্যই বানানো। কিন্তু বানানো মিথ্যা নয়, বানানো সত্য।"[৭]

'মৃগয়া' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে জমিদারি প্রথা, স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদিকে ছেড়ে এলেও দ্বিতীয় খণ্ড তারই সূত্র ধরে এগিয়ে চলে। আমরা দেখতে পাই ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজের হাতের শাসনের রাজদণ্ডটির শুধুমাত্র স্বাধীনতা নামক পোষাকি নাম পরিবর্তন হয় মাত্র। তাই আনন্দ সাগরের ঢেউ সাগরপারে ভালো রকম আছড়ে পরার আগেই শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যার মতো জাতীয় সমস্যা। কারণ স্বাধীনতা নামক মরীচিকার রেশ তখনও রয়ে যায় হরবল্লভদের মতো তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিদের হাতে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের পশ্চাদপটে ফুটে ওঠে একই পরিবারের দুটি কাহিনি। যা একক পরিবারকেন্দ্রিক হয়েও একক নয়, বহুস্বরিক। একদিকে সুদর্শন সিংহবাবু পরিবারের সর্বনাশ আর অন্যদিকে তার ভাই হরবল্লভদের সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শোষণযন্ত্র বদলের অদম্য প্রয়াস। কারন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে যে আধাসামন্ততান্ত্রিক সমাজ তৈরি হল তার ভিত কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। তার পটভূমি তৈরি হচ্ছিল বহুদিন ধরে। আর সারা ভারতবর্ষে হরবল্লভদের দল ভোজভাজির দ্বারা নিজেদের রঙ পাল্টাতে ব্যস্ত ছিল। প্রতাপের বহুকৌণিক আধারে কিভাবে শোষকরা গিরগিটের মতো রঙ বদলায়, তাই লেখকের কথায় স্পষ্ট হয়,

> "আচমকা স্বাধীনতা এল। রাতদুপুরে। ঘুম ভেঙ্গে তড়িঘড়ি উঠে বসতে তিলমাত্র দেরি হয়নি হরবল্লভের। চটপট খদ্দর চড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে, টুপি লাগিয়েছেন মাথায়, হারানো দিনের ক্লেদাক্ত স্মৃতিগুলিকে মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছেন কংগ্রেস তহবিলে। বিনোবাভাবের ভূদান যজ্ঞে বত্রিশভাগী জঙ্গলের লাগাও যাট বিঘের কাঁকুড়ে ডাঙাখানি এক লপতে দান করে ফেলেছে।... এখন হরবল্লভ শাসকদের সোল এজেন্ট।...ওঁর বাড়ি ছাড়া

> কংগ্রেসের মিটিং হওয়া দুষ্কর। দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেট, এস.ডি.ও এবং জেলার তাবড় তাবড় বাবুভায়ার সঙ্গে ইদানিং হরবল্লভের ভারি দহরম মহরম।"[৮]

'মৃগয়া'র পটভূমি যে বিরাট একটি কর্মকাণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে তার অন্যতম একটি উপাদান রাজনৈতিক পটভূমি। মূলত এটি রাজনৈতিক উপন্যাস না হলেও মহাসময়ের পটভূমিকায় রাজনীতির যে দাবানল ছড়িয়ে আছে দেশের প্রতিটি স্তরে স্তরে তার একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল 'মৃগয়া'। এটা তো একদিনের মৃগয়াক্ষেত্র নয় তার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে আছে এক বিরাট সময়, জমিদারতন্ত্র থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রায় শেষ দশক পর্যন্ত। যে বিরাট সংখ্যক লোক একদা জমিদারতন্ত্রের মাধ্যমে শাসন ও শোষণ করার ক্ষমতা পেয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তারা আস্তে আস্তে হয়ে উঠল বিভিন্ন পার্টির জনপ্রতিনিধি। বৃটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বীজ বপন করে বাংলার কৃষক সমাজের যে মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল স্বাধীনত্তোরকালে দেশের রাজনীতিবিদরা অন্যভাবে তার গোড়ায় সার দিয়ে গেছেন। ফলে রাজনীতির ছত্র ছায়ার বিরুদ্ধে কৃষকদের বার বার সংঘবদ্ধ হতে হয়েছে। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি তেভাগা, তেলেঙ্গানা, জলডুবির মতো বিদ্রোহ; এমনকি হাল আমলে স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতে ঘটেছে নকশালবাড়ি আন্দোলন। হিন্দু এবং মুসলমানকে বিভাজিত করাকে লক্ষ নিয়েই পরিকল্পনা হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং আমরা লক্ষ করেছি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়েও এই প্রচেষ্টা বদ্ধমূল ছিল। সুনীতি কুমার ঘোষ লিখেছেন,

> "বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক দিক থেকে খর্ব করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ১৯০৫ সালে বাংলাকে ভাগ করেছিল। কিন্তু দুই বাংলার আদিবাসীদের মধ্যে কোনো কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি হয়নি; দুই অংশের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রাচীর গড়ে তোলা হয়নি; লক্ষ লক্ষ বাঙালি পরিবারকে ছিন্নমূল করার ব্যবস্থা করা হয়নি। এই সমস্ত ব্যবস্থাই পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে।"[৯]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪), জাপানী আক্রমণ (১৯৪২), আগষ্ট অন্দোলন (১৯৪২), মন্বন্তর (১৯৪৩), তেভাগা আন্দোলন (১৯৪৬), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ (১৯৪৭), উদ্বাস্তু সমস্যা (১৯৪৭-৫০) বিশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকে ভারতবর্ষে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি প্রতিটি ঘটনার পেছনেই ছড়িয়ে আছে রাজনীতির কালোহাত। এই রাজনীতি আরো জটিলতা ধারণ করে পরবর্তীকালে। সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে চীন-ভারত যুদ্ধ (১৯৬২), খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬), নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭-৬৯) প্রভৃতি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের জনজীবনকে ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। সাতের দশকের বাংলার রাজনৈতিক পটভূমির উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা (১৯৭৫)। ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের মধ্যে দুই দল গঠিত হয় এবং নতুন করে বাংলা কংগ্রেস তৈরি হওয়ায় রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত আরো জটিল হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে একচেটিয়া কংগ্রেসের শাসনে মানুষের জনজীবন অতীষ্ঠ হয়ে পড়লে তারা আশ্রয়ের খোঁজে যোগ দেয় মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিতে। এদিকে চীন-ভারত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসরা কম্যুনিস্টদের ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগ করে বিনা বিচারে বন্দী করতে শুরু করে। আবার কম্যুনিস্টদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের ব্যবধান আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করায় তারা নিজেরাই একদলকে ভারতবিরোধী দলের বলে আখ্যা দেয়। ফলে অনিবার্যরূপে দেখা দেয় ভাঙন, তৈরি হয় সি পি আই এবং সি পি আই (এম)। এই সময় পর্বের বাস্তব চিত্রই যেন ফুটে উঠতে দেখি 'মৃগয়া'র ৩য় খণ্ডে।

উপন্যাসের ১ম খণ্ড থেকে ৫ম খণ্ড পর্যন্ত পুরো জায়গা জুড়ে রয়েছে রাজনীতির ধারাবাহিক অনুপুঙ্খ শুরু হয় আধিপত্যবাদ রাজনীতি দিয়ে। কিন্তু আধিপত্যবাদী জমিদার পরিবার থেকেই বেরিয়ে আসে পরে বিবরণ। ১ম চারটি খণ্ডের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাগুলি। উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের হোতা। উপন্যাসে আমরা দেখি স্বাধীনতা আসে আর সঙ্গে নিয়ে আসে মানুষের জীবনের চরম অভিশাপ দেশভাগ। অপরদিকে কংগ্রেসের শক্তি ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হতে থাকে। তারই সাথে সাথে জেগে উঠতে থাকে কম্যুনিস্টদের লড়াই, বাঁকুড়ার জলডুবি আন্দোলন, দুই-দুইবার রাষ্ট্রপতি শাসন, নকশাল আন্দোলন, জরুরী অবস্থা প্রভৃতি।

স্বদেশী অন্দোলনের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তাতে সাধারণ মানুষের খুব বেশি জড়িত হতে আমরা দেখিনি। তা নিতান্তই শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের লড়াইরূপে প্রতিভাত হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায় আসে না। পরীক্ষিতের কথায়,

"বেল পেকেছে আইজ্ঞা, বেল খাউকাদিগের ফূর্তি, আমরা হইলাম কাগের জাত।"[১০]

এরই হাত ধরে এল ১৯৫৫ সালের ভূমি সংস্কার আইনের কথা, তখন দেখতে পাই ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি হ্রাস করতে তা তৈরি হলেও ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ অটুট থাকে। পরবর্তীকালে আইনের ফাঁক-ফোঁকড়ই হয়ে যায় আইন ধ্বংসের মোক্ষম অস্ত্র। ফলে ভূমিহীনদের উদ্দেশ্যে আইন তৈরি হলেও তা শুধু খাতায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কংগ্রেস শাসনে জমিদারের প্রভাব কমেনি বরং তা বেশ রমরমিয়ে চলতে থাকে। এর বিরুদ্ধে আমরা আস্তে আস্তে সংঘঠিত হতে দেখেছি কম্যুনিস্টদের। সুকুমার আচার্য, তিলক বাউরি। হঠাৎ মুর্মু গোপনে সংগঠনের কাজ করে। অন্যদিকে গান্ধীজীর স্বপ্নের কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখি একদা স্বাধীনতা সংগ্রামে অনাদি ডাক্তারকে বাংলা কংগ্রেস তৈরির মাধ্যমে। লক্ষণীয়ভাবে একদিকে ভূমি সংস্কার আইন, বাংলা কংগ্রেসের জন্ম, অন্যদিকে কম্যুনিস্টদের গোপন সাংগঠনিক কাজ মিলে এক ব্যাপক রদবদলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তারপর আসে ১৯৬৭ সাল। প্রথম গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। বামপন্থীরা জয়ী হওয়াতে সাধারণ মানুষ তাদের পূর্ণ সমর্থন করে। বামপন্থীরা তখন ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি কমাতে তৎপর হয়। ফলে শুরু হয় জমিদার ভূস্বামীদের নানাভাবে হেনস্তা করা। তখন আবার বামদের মধ্যে মতের অমিল হওয়ায় তৈরি হয় উগ্র বামগোষ্ঠী। এভাবে সমগ্র ৩য় খণ্ড জুড়েই রয়েছে রাজনীতির নাগপাশ। কংগ্রেসের হাত থেকে বামদের হাতে শাসনভার গেলেও সাধারণ মানুষ সে তিমিরেই থেকে যায়। শুধু মাঝখান দিয়ে ঘটে যায় হাত বদলের পালা।

'মৃগয়া' ৪র্থ খণ্ডে আসতে আমরা অনেকটা সময় পেরিয়ে আসি। যে সময়ে এসে সুখস্বপ্নের কল্পনাই করা যায় না । যখন ভূমিসংস্কার আইন চালু হল, তখন ভূমিহীনরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে এক টুকরা ভূমির জন্য। কিন্তু দেশের শাসকদল ছলে বলে ভূস্বামীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে গেল। তখন গরীবের হয়ে কথা বলতে এল বামপন্থী দল। ৪র্থ খণ্ডে আমরা দেখি সরকার গড়েছে যুক্তফ্রন্ট। মানুষের মনে তখন আনন্দের জোয়ার। গরীবরা ভাবল এবার হয়তো তাদের ভূমি ফিরে পাবে। যুক্তফ্রন্ট সরকার তখন করে চলেছে ভূস্বামীদের 'দুর্যোধনের উরুভঙ্গপালা'। তখন দেশে শুরু হয় আরো এক অস্থির মুহূর্ত। আমরা দেখলাম সব শেষে 'হরির লুট এক গণতান্ত্রিক উৎসব'। গরীবের সেবক হয়ে গেল নিজেদেরই সেবক। ফলে পশ্চিমবঙ্গ আর সোনার বাংলা হয়ে উঠতে পারল না। গরীবরা আরো গরীব হল। ধনী আরো ধনী। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে নিষ্পেষিত হয়েছে কোটি কোটি মানুষ। উপন্যাসে আমরা পাই,

> "অবস্থার তিলমাত্র উন্নতি হয় নাই আইজ্ঞা। সুকুমার বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছে। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে আইনে, কিন্তু তাতে করে মাথার উপর মালিক হটে যায়নি । এখনো তারা পদে পদে অনুভব করে, তাদের মাথার উপর একদল উপরওয়ালা রয়েছে। তাঁরাই নিয়মকানুন বানান, দয়াদাক্ষিণ্য করেন, এলাকার জন্য কী কী করা হবে, কী কী করা হবে না, ওপর থেকে একদল মানুষ স্থির করে দেন।"[১১]

বস্তুত 'মৃগয়া' উপন্যাসের একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে আমলাতন্ত্রের ব্যঙ্গচিত্র। অবিনাশ ভৌমিক কিংবা তাপস দাসগুপ্তের মতো বিডিও, করালী সোম কিংবা কৃষ্ণ নাগের মতো অফিসার তাদের সব শঠতা নিয়েই উপস্থিত। জেলায় মন্ত্রীর আগমন নিয়ে যে দৃশ্যের অবতারণা করেছেন লেখক তা নিঃসন্দেহে একটি উচ্চমার্গের প্রহসন। বন্যা কিংবা খরার ত্রানবন্টনের ভিতরকার ছবিটা তুলে ধরায় ভগীরথ কোনো আড়াল করেন নি, এবং সেই সঙ্গে রসবোধেরও পরিচয় দিয়েছেন। তবে আশার কথা এই যে অমলজ্যোতির মতো বিডিওরা আছেন, আছে বুদ্ধদেবের মতো গ্রামসেবকও, তাই তীব্র হতাশার মধ্যেও কখনো আলো জ্বলে ওঠে। সময়ের একটা বড় পরিসরকে ধরেছেন বলেই লেখক বলতে ভোলেননি নকশালবাড়ির কথা। দেখিয়েছেন মিথ্যা চুরির দায়ে অভিযুক্ত বুদ্ধদেব কিভাবে প্রশাসনের আন্তরিকতার প্রতি আস্থা হারিয়ে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেয়, মেধাবী ছাত্রী সুরঞ্জনা কিভাবে বাউরি বাগদিদের সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে ।

'মৃগয়া' উপন্যাসকে যথার্থই একটি ইতিহাস বলা যায়,যে ইতিহাস তৈরি হয়েছে সময় ও সমাজের দ্বিরালাপে। উপন্যাস ক্রমান্বয়ে এগিয়ে গেছে সময় থেকে সময়ান্তরে। আর আমরা দেখতে পেয়েছি মানুষের জীবনবোধের ক্রমপরিবর্তন। প্রথম খণ্ডে মানুষের ইতিহাসের যে পর্ব-সূচনা হয়েছিল ৫ম খণ্ডে যেতে যেতে তারই মধ্যে তৈরী হয়েছে হাজারো বাঁক। উপন্যাস শুরু হয়েছে সিংহ পরিবারের নিদারুণ অত্যাচারের ঘটনার মধ্য দিয়ে। ৫ম খণ্ডে জমিদারী রাজত্ব হয়তো গেছে, কিন্তু অত্যাচারের রাজত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি বরং তা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেচে। ২য় খণ্ডে যে বুদ্ধদেবকে পাই দেশসেবার জন্য নিয়োজিত প্রাণ, ৫ম খণ্ডে এসে দেখি তার শোচনীয় পরিণতি। নিরপরাধ লোকটি মাথায় বুলেট নিয়ে সেই ১৯৭৬ সাল থেকে জেলে বন্দী হয়ে আছে । সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গের কথা বললে আমরা যা বুঝি পরবর্তীকালে সরাসরি রাজনীতিতে দেখি তাদেরই আধিপত্য। তাদের সাথে এক হাতে হাত রাখতে দেখি দেবিদাস সিংহবাবু, অঞ্জন কয়াল, বিমল শীল, রতন গাঙ্গুলী, বাঘা ঘোষদের। তবুও এই সার্বিক হতাশার মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না লেখক, পারে না সন্ন্যাসী তুঙ, পুলকেশ, সুকুমার আচার্য কিংবা চন্দন দাসরাও। দেবিদাস আর বাঘা ঘোষদের বিরুদ্ধেতারা রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু বোঝে আসল সমস্যাটা অন্য জায়গায়। এই পৃথিবীটা তো এক বিরাট নৃগয়া ক্ষেত্র, যেখানে অবিরাম চলছে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। এক আলাপচারিতায় ভগীরথ মিশ্র বলেছেন,

> "আমি তো এমনিতেই মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী একজন মানুষ। আমিও একটা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু এই একটা বিষয়েই সত্যি সত্যি আমার মধ্যে কিছু দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। দ্বন্দ্বটা এইখানে যে, মানুষ যে একটা শোষণমুক্ত সমাজের কথা ভাবছে, তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পুরো সময়কালটিই তো একটা ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন শোষণের ইতিহাস।...শোষণের প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি বন্ধ করতে গেলে মানুষের মন থেকে শোষণের প্রবৃত্তিটাকেই নিঃশেষে নির্মূল করতে হবে, আর সেক্ষেত্রে মানুষের অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে, কেন কি জীবজগৎ আর উদ্ভিদজগৎকে প্রতি মুহূর্তে শোষণ করতে না পারলে মানুষ বাঁচবেই না। ...এর থেকে তো তার কোনো রেহাই নেই। এ প্রশ্ন আমার

> মনে অনেকদিন ধরেই ... আমি বিশ্বাস করি মার্ক্সবাদকে সত্যকারের রূপ দিতে গেলে এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পাওয়াটা জরুরী।"[১২]

'মৃগয়া' উপন্যাসের ৫ম খণ্ডটি এভাবে একেবারেই সাম্প্রতিকের ভাষ্য হয়ে ওঠে। 'রাজনীতি এক প্রয়োগ বিজ্ঞান' নামাঙ্কিত উপপর্বে হারান সরকার আর সুকুমার আচার্যর কথোপকথনের মাধ্যমেই ফুটে ওঠে পার্টির আদর্শগত বিচ্যুতির কথা। কিন্তু তা বলে সব কিছু তো এখানে এভাবে থমকে যেতে পারেনা। তাই শেখ পাড়ার অনাথ শিশুদের আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা করে সুকুমার। নিয়ে আসে মুকুন্দ শিকারির কুটুম কাটামের ওয়ার্কশোপে, ক্রমশ দরজা জানালা বসিয়ে জায়গাটাকে বাসযাগ্য করে তোলে আর ডুবে যায় তার নতুন প্রকল্পে-মানুষ গড়ার কাজে। উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসে গল্পের ছলে সে 'মানুষ' নামক বিষয়টি পড়ায় ওদের। 'মৃগয়া'র কাহিনি সুবিশাল । পটভূমি বিস্তৃত। চরিত্রমালা দীর্ঘ, তা যেন ভারতাত্মারই নানাস্তর। - ভারত, অশিক্ষিতের ভারত, গরীবের ভারত, ধনীর ভারত, উচ্চবংশীরের ভারত, অন্ত্যজের ভারত, ধনবাদের ভারত, সমাজবাদের ভারত, 'মৃগয়া'তে বাণীরূপ পেয়েছে। কেউ কেউ তারাশঙ্করের সঙ্গে ভগীরথ মিশ্রের তুলনা টানেন। বাইরে বাইরে সামন্ততন্ত্র দুজনের লেখার বিষয় হলেও তারাশঙ্করের রয়েছে এর প্রতি নারী শ্রদ্ধা আর ভগীরথ মিশ্র চিহ্নি করেছেন সামন্ততন্ত্রের পচন। তারাশঙ্করের সামন্ত প্রভুরা ধনতন্ত্রের নায়কদের কাছে পরাস্ত হয়ে ট্র্যাজিক হিরোতে পরিণত হয়েছে আর ভগীরথে দেখি ধনতন্ত্র তথা বৈশ্যতন্ত্রের কোলের সহবাসমত্ত সামন্তবাদ যার প্রভাবে অসহায়ত্বে পঙ্গু হয় সামন্তপ্রভু। কনকপ্রভা ও কুন্তী কর্তৃক ওমপ্রকাশের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার আখ্যানটি এইক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য।

তবে পচনের ছবি একেই কি 'মৃগয়া'র ক্ষান্তি? না আমরা দেখি বিশ্বগত শান্তির মানবতাবোধের বীজ লুকিয়ে আছে উপন্যাসের অভ্যন্তরে। সুকুমারের নববোধে উত্তরণ, অনেক শিশুর কলতানে, মুকুন্দের চেতনালোক প্রাপ্তিতে তার নিয়তি সূচিত । খাদ্য-খাদক শিকলের যে বিস্তার পাঁচখণ্ড মৃগয়ার মর্মকথা তার অত্যচিহ্ন এভাবেই অঙ্কন করেন কথাকার। সামাজিক বাস্তবতার খোলস ছেড়ে এখানেই মৃগয়ার কথকতা অন্ত্যবাস্তবতায় ঢুকে। উপন্যাসের ভারতীয় মডেল হয়েই ঢুকে। আর এখানেই 'মৃগয়া' ও তার সৃষ্টির অনন্যতা।

**তথ্যসূত্র:**

১. 'The Novel and the People'-Ralh Fox, Eagle Publication, 1944, Page No.- 2
২. বন্দ্যোপাধ্যায় ড. জলি মল্লিক, বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, পৃঃ ৩
৩. ভট্টাচার্য ড. তপোধীর, উপন্যাসের সময়, সুবল সামন্ত এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৯০, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, পৃঃ ৪০
৪. আচার্য অনিল সম্পাদনা, সত্তর দশক, অনুষ্টুপ, কলকাতা- ০১, ২য় সংস্করণ- ১৯৯৪, পৃঃ ৬৩
৫. মিশ্র ভগীরথ, মৃগয়া ১ম খণ্ড (৫ম খণ্ড একত্রে), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ২০০৪, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১০
৬. মুখোপাধ্যায় অরুণ কুমার, মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৪, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ২০

৭. রায় সত্যেন্দ্র, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ-২০০০, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১৫

৮. মিশ্র ভগীরথ 'মৃগয়া' ২য় খণ্ড (৫ম খণ্ড একত্রে), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ২০০৪, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ৪৯

৯. ঘোষ সুনীতি কুমার, বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি ও রাজনীতি, নিউ হরাইজন বুক স্ট্রাস্ট, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০১, পৃঃ -কথারম্ভ

১০. মিশ্র ভগীরথ, 'মৃগয়া' ১ম খণ্ড (৫ম খণ্ড একত্রে), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - ২০০৪, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১১৪

১১. তদেব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১২

১২. মজুমদার সমীরণ সম্পাদন্ অমৃতলোক, সংখ্যা ১০৬, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-১, প্রকাশকাল ২০০৬, পৃঃ ২৯০।